॥ প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী অভিনব গ্রন্থ-সম্ভার ॥

জাপানী দেবতা

[কিশোর হাসির গল্প মেলা]

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

নূতন প্রকাশ :

প্রকাশক :
পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

মুদ্রক :
বাদলচন্দ্র পাল
এস্. এম্. প্রিন্টিং
১৯ ডি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

প্রচ্ছদপট :
প্রভাত কর্মকার

মূল্য : সাত টাকা


উপহার

আমাদের প্রকাশিত

॥ ছোটদের বইয়ের মেলা ॥

—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর—

রাজা আর টুনটুনি

উপেন্দ্রকিশোরের মিষ্টি গল্প

জন্তু-জানোয়ার

—সুকুমার রায়ের—

পাগলা দাশু

সুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

—সুলেখা সেনের—

ঠাকুরমার ঝুলি

ঠাকুরদার ঝুলি

দেশ-বিদেশের রূপকথা

রূপকথার আসর

হাল্‌কা হাসির গল্প

—কালোপাঞ্জার—

নিশির ডাক

ভূত-পেত্নীর কবলে

॥ জাপানী দেবতা ॥

জাপান দেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরনো পুঁথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল তখন সেটা তেলের মত পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমুদ্রে ভেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি,—তাঁরা মরে গেলে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী'; তার স্ত্রীর নাম ছিল 'ইজানামী'।

অন্য দেবতারা এঁদের দু'-জনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের কর।'

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, 'আচ্ছা।' বলে তারা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তয়ের করে তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখানে থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি 'জাপান', কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে 'নিপ্পন' বা 'দাই-নিপ্পন'।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে 'আগুন-দেবতা' একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে 'কান্না-পরী'র জন্ম হল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন। তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন,—সেই যেখানে মৃত্যুর পর সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজায় গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।' এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কী বলব। এমন ভয়ঙ্কর নোংরা জায়গার কথা কেউ ভাবতেও পারে না; আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এসব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে 'ধর ধর' বলে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি।

কী বিষম গন্ধই সে জায়গায় ছিল; দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে তেমন আর কেউ কখনো দেখেনি। সেই মেয়েটির নাম 'গগন-আলো', তিনি সূর্যের দেবতা।

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর একটি সুন্দর দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'তেজবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, তুমি হলে স্বর্গের রানী।'

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, 'তুমি হলে রাত্রির রাজা।' আর তেজবীরকে বললেন, তুমি হলে সমুদ্রের রাজা।' তখন গগন-আলো গিয়ে স্বর্গের রানী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু

তেজবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকল, তবুও তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বললেন, আরে তোর হল কী? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস?'

তেজবীর বললেন, 'আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।'

ইজানাগী বললেন, 'তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে!' বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন-আলো জানতেন তাঁর মন ভাল নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না-জানি কেন এসেছে!'

তেজবীর কিন্তু বললেন, 'বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।'

গগন-আলো বললে, 'তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাও তো।'

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও তো। গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুঁড়ো পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কার? গগন-আলো বললেন, তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে আমার।'

কথাটা তো বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হলে কী হয়, গগন-আলোর গহনা থেকেই যে বেশি দেবতা হয়েছিল, কাজেই সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না। তাতে তিনি বিষম চটে গিয়ে গগন-

আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাদ ভেঙে তেজবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন-আলো কী করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন, তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক; সেই আলোর মালিক যখন গুহায় লুকোতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বলল, 'সর্বনাশ! এখন উপায়?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশি তয়ের করল, আর যারপরনাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কী জিনিস খুঁজে নিয়ে এল। সেইসব জিনিস আর সেই আরশি আর সেই মালা দিয়ে গগন-আলোর পূজা করে, তারপর তারা হেসে, গেয়ে, নেচে, লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে, কী যে একটা শোরগোল জুড়ে দিল, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

গুহার ভিতর থেকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না জানি কী হয়েছে!' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস?'

তারা বলল, 'গোলমাল করব না? দেখ এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি!' বলেই সেই আরশিখানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন— আর অমনি সকলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে তেজবীর ঘুরতে ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুটি বুড়ো বুড়ি একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?'

বুড়োটি বলল, 'বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কী করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটি অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ঙ্কর অজগর, তার আটটি মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারেও এটিকে খাবে। তাই আমরা কাঁদছি।'

তেজবীর বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি যা বলছি, তাই কর। আট জালা খুব কড়া রকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের কর তো। করে ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কী হয়।'

বুড়ো সেইদিনই আট জালা সাকী তয়ের করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল; সাকীর গন্ধে চারদিক ভুর-ভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস-ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল; তবু হুঁস নাই, সে চোঁ-চোঁ করে খাচ্ছে। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তা দেখে তেজবীর বললেন, 'আর কী? এইবেলা!' বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নিয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তার লেজটা কিন্তু ভারি শক্ত ঠেকল। কিছুতেই কাটা গেল না, বরং তাঁর তলোয়ারই ভেঙে গেল। তখন তেজবীর খুঁজে দেখলেন যে সেই লেজের ভিতর আশ্চর্য রকমের একখানা

তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখনি সেই তলোয়ারখানা বার করে নিলেন।

তখন তো সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, দু-জনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যারপরনাই আদর যত্নে থেকে বুড়ো বুড়িরও শেষকালে খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে ; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, 'দাদা, চল না, তোমার কাজটি আমি করি, আর আমার কাজটা তুমি কর,—দেখি কেমন হয়।' বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দিয়ে দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ তো ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন দীপ্তানল বললেন, 'ভাই, শখ কি মিটেছে ? এখন কেন আমার বঁড়শি আর আমাকে ফিরিয়ে দাও না ?' তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন যে, 'দাদা, বঁড়শি তো মাছে নিয়ে গেছে, এখন কী করে দিই ?' এ কথায় দীপ্তানল যারপরনাই রেগে বললেন যে, 'সে আমি জানি না ; আমার বঁড়শি আমাকে এনে দাও!'

তখন তৃপ্তানল আর কী করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না ; তিনি বললেন, 'ও আমি চাই না ; আমার বঁড়শি নিয়েছ, তাই এনে আমাকে দাও।'

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হয় না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।' তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, 'হায়

হায়! এখন আমি কী করি? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?'

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরও কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কী করি?' লবণেশ্বর বললেন, 'তুমি কেঁদো না, আমি যা বলছি তাই কর।' বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, নৌকায় চড়ে তুমি এই এই পথ দিয়ে যেতে থাকবে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁশ দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে, বাগানের ভিতরে, কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে, তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সেই বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

এ কথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হ্যাঁ, গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে?' দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে জল এনে তাঁকে খেতে দিল। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তারপর গেলাস ফিরিয়ে দেবার সময়ে নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায় নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জল খাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বললেন,

'এ কী? গেলাসের ভিতর মণি কোত্থেকে এল রে?' দাসীরা বলল, 'তা তো আমরা জানি না, কুয়োর ধারে একটি রাজপুত্র বসে আছে। সে আমাদের কাছে জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয়ত তারই হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও এ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যারপরনাই আশ্চর্য আর খুশি হয়ে বললেন, 'আরে, তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রানী গগন-আলোর নাতির ছেলে? তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এস এস, ঘরে এস!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড়হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজা অনেক ধূমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তার পর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন তৃপ্তানল কেমন আছেন, রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভাল আছেন।' এমনি করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।' শুনে রাজা বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা,—ডাক্ তো রে সকল মাছকে!' রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'বল তো, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল ?' তারা সকলে বললে যে, 'তাই মাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।' তখন রাজামহাশয় তাকে বললেন, 'হাঁ কর্ ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কী আছে!' এ কথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-আ-ক্!' করে দু-হাত চওড়া হাঁ-টি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বঁড়শিটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটাকে বার করে আনা হল। তখন তো আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজামশাই তাঁর হাতে বঁড়শিটি, আরো দুটি মানিক তাঁকে দিলেন। তার একটির নাম জোয়ার-মানিক ; তাকে ছুঁড়ে মারলে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাটা-মানিক ; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, 'তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস। দেখো যেন তার কোন ক্ষতি না হয়।'

সেই পাহাড়ের মত কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিয়ে দিতে আর বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশি হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কী করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার মানিককে ছুড়ে মারলেন। মারতেই তো সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন আর তিনি যাবেন কোথায় ? ঢক-ঢক জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'রক্ষে কর ভাই! আমার ঘাট হয়েছে,—আমি আর অমন করব না!' সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা মানিক ছুড়ে জল সরিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তার পর থেকে দীপ্তানল ভাল মানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

॥ জোলা আর সাত ভূত ॥

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত। একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেই দিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল, চ্যাপ্টা-চ্যাপ্টা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে খেয়ে ভারি খুশি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব।'

জোলার মা বলল, খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?'

জোলা বলল, 'খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পারে, সেখানে গিয়ে খাব।' বলে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব।'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছের নীচে চলে এল, যেখানে হাট হয়। সে গাছের তলায় এসে নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব
সাত বেটাকে চিবিয়ে খাব।'

এখন হয়েছে কি,—সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের তো বড্ডই ভয় হয়ে গেছে। তারা সাতজন গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে! ঐ দেখ্, কোত্থেকে এক বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কী করি বলত?

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে

হাত জোড় করে তাকে বলল, দোহাই কর্তা ! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না ! আপনাকে এই হাঁড়িটা দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন ।'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মূলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ,—তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই তো সে এমনি চমকে গেল যে সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না । সে বলল, হাঁড়ি নিয়ে আমি কী করব !'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন ।'

জোলা বলল, 'বটে আমি এখন পায়েস খাব ।'

বলতে বলতেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল । তেমন পায়েস জোলা কখনও খায়নি, তার মাও খায়নি, তার বাপও খায়নি । কাজেই জোলা যারপরনাই খুসি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা ! বড্ড বেঁচে গিয়েছি !'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে । তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কী করে বাড়ি যাব ? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেখানে যাই ; তারপর বিকালে বাড়ি যাব এখন ।'

বলে সে তো তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে । সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু । সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে ?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ ?

বন্ধু বলল, 'বটে ? আচ্ছা দেখিতো কেমন গুণ ?'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি ।'

বন্ধু বলল, আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া,

পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর, জিলিপি, অমৃতি, বরফি, চমচম, এইসব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ সব দেখে বন্ধু ভাবল যে এ জিনিষটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কী কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম পড়ছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি-সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল, কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা, বিছানা করে দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদলে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখ মা, কী চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি! তুমি কি খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখ আমি ভিতর থেকে সে-সব জিনিষ বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এতো আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে সব জিনিষ বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা বনে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন তো জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে, সেই ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, একথা তার সন্দেহ হলো না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছের নিচে যেয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব।'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে

তাকে হাত জোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কী গুণ?'

ভূতেরা বলল, 'ওকে সুরসুড়ি দিলে খালি ও হাসে, আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে তো আর হাসি ধরে না! সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে এ জিনিষটি বন্ধুকে না দেখালেই নয়!

সে দিন তার বন্ধু আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দু-হাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙ্গল না। তার বন্ধুতো এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি করে তার জায়গায় আর একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল; এসে দেখল যে তার মা দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ করতে আর হবে না মা, আমার ছাগলের গুণ শুনলে খুসি হয়ে তুমি নাচবে।' বলেই সে ছাগলের গায়ে আঙুল দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসল না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুরসুড়ি দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু।

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি এক বিষম গুঁতো মারল যে সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে তেমন বকুনি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কী বলব! সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল।

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

বেটারা আমাকে দু-বার দু-বার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস—আজ আর তোদের ছাড়ছি নে?'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল. 'সে কী মশাই, আমরা কী করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগলটা দিয়েই বা কি করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম?

জোলা তার নাগ দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না গুঁতো মেরে সে আমার কী দশা করেছে! তোদের সব কটাকেই চিবিয়ে খাব।'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়! আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই তো হয়েছে। আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু ছাগল চুরি করেছে।' এ কথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক! সে বেটাই আমার হাঁরিও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কী হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছা লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁরিও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে। ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়ে বলবেন, 'লাঠি, লাগ্‌তো! তা হলে দেখবেন, কী মজা হবে। লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধুতো ভেবেছে না জানি কী মজা হবে। তার পর জোলা যখন বলল, 'লাঠি, লাগতো,' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখেনি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা

অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে গিয়ে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পরি ভাই তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে!'

জোলা বলল, 'আগে হাড়ি আর ছাগল আন তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধু মশাই আর কী করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর কলসি হাজির করল। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক তো!' অমনি হাঁড়ি সন্দেসে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরীব নেই, সে বড় মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া, খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যারপরনাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কী, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাকে ধরে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

রাজা মশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'এখন কী করি বল তো? বেঁধেই ও নেবে দেখছি!'

জোলা বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহ দরজার বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতী ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধূলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মত এক হাতি চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয় !

তারপর যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ্ তো !' আর যাবে কোথায় ? তখনি এক লাঠি লাখ-লাখ রাজা আর হাতি ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল সে যারা পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই !'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু করে হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও !'

তখন জোলা গিয়ে রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে, আর তার রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে,—'দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও ? এখন কী হুকুম হয় ?

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিল। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে মাপ করব।

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল ! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে তবে হয়ত এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত !

॥ কুঁজো আর ভূত ॥

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ঙ্কর কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালমানুষ ছিল। লোকের অসুখে-বিসুখে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে কেউ তাকে ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল; আর কোন ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত, তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড় দুষ্টু লোক; তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে রাখত বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। আর সে জায়গাটা ভারী বিশ্রী। লোকে প্রাণান্তেও সেই পথে আসতে চায় না, বলে ওটা ভূতের বাড়ী। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই। কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করে?

কতক্ষণ সে এভাবে বসে ছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন সেই পুরনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল গানের সুরটি অতি আশ্চর্য্য। কিন্তু কথা খালি এইটুকু:

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, হিং হ্যায়!'

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল, সে ভাবল যে তারও

গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সে-ও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল :

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়. ইমলি হ্যায়, হিং হ্যায় !'

এইটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু স্বরে গাইল :

'লস্থুন হ্যায়, মরিচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায় !'

কানাই এই কথাগুলি খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল—সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই, সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত, তারা এই নূতন কথাগুলি শুনে এতই খুশি হল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে যেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল ! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল :

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লি হ্যায়, হিং হ্যায় !
লস্থুন হ্যায়, মরিচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।'

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন হঠাৎ তার মনে হল, 'কী আশ্চর্য্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কি করে ?' বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল—এ কি ? তার সে কুঁজ যে আর নেই ! একজন ভূত বলল, 'কী দেখছিস বাপ! ওটা আর ওখানে নেই, ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে।'

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, সেটা তার পাশে পড়েছিল। আহা ! কানাইয়ের তখন কি আনন্দই হল ! আর হালকা আর আরাম বোধ হল এমনি, যে সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ীর বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে ; ভূতেরা

তাকে একটি চমৎকার নতুন পোষাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে দিয়েছে, তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে মনের সুখে বাড়ী চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, একথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল. যে শুনল সে-ই ভাবল যে এমন আশ্চর্য্য কথা আর কখনও শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না। তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য্য খবর শোনবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গা, কেবলহাটি যাব কোন পথে?' কানাই বললে, 'এই তো কেবলহাটি; তুমি কি চাও?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিলো। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।

কানাই বলল, 'আমিই তো সেই কানাই, ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল, এর তো মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম; তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নতুন পোষাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কথা কানাইয়ের কাছ থেকে জেনে নয়ে, তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইরে কুঁজের চেয়েও

ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্টু আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এনে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে যাবে, তারপর সেই ভূতেরা ধরেছে, 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লি হ্যায়' অমনি মানিক তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা হ্যায়।

তখন গানের তাল ভেঙে তো গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এসব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিচুতে খিচুতে এসে বলল, 'কে রে তুই, অসভ্য বেতলা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি ? দাড়া তোকে দেখাচ্ছি !' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপর বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ীর লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য্য আর দুঃখিত হল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।

॥ গুপি গাইন ও বাঘা বাইন ॥

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, আর বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদির দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত 'গুপি গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতরে গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলকে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিচোত আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-া-া!! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্!!! শেষে যখন, 'হাঁঃ, হাঃ, হা-হা!' বলে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন'। তার এই

বাঘা নামটাই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কী, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙ্গত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, না হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে?' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিন রাত বাজিয়েও বাঘা সেটা ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনতে শুনতে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিন কতক এই ভাবে চললে কী হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী দাদা! তোমাকে দশ হাড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও; নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব।'

বাঘা আর কী করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দুদিন থাকতে না থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়, দুটার সময় তার নিজের গ্রামে যেয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায়

করে বলে, 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে কেউ আর তাকে খেতে দেয় না। আর ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মুর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে যাওয়াই ভাল। না-হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!' এই বলে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে করে বনে চলে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায়নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো! ওটা এলেই তো ঢোলক শুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে।'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু আর কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘার মতই ভয়ে কাঁপে। শেষে একটু ভাবল, 'এবনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপি চুপি বন থেকে বেড়িয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে, আর একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় করে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বলল, 'আমি বাঘা বাইন। তুমি কে?'

গুপি বলল, 'আমি গুপি গাইন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বলল, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গান-বাজনা বোঝে না, তাই ঢোলকটি নিয়ে বনে এসেছিলাম। তা ভাই এখানে ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বলল, 'তাই তো! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক

শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বল তো, তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে বটগাছ তলায়।'

গুপি বলল, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে হরতুকিতলায় বসে।'

বাঘা বলল, 'সে তো আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম!'

এতক্ষণ তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে গুপি বলল, 'ভাই আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দু'জনে জুটলে নিশ্চয় কিছু একটা করতে পারি।'

একথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দু'জনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে; রাজামশাই যে তাতে খুব খুশি হবেন, তাতে তো ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।'

গুপি তার বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দু-জনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ী যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে পয়সা কোথায় পাবে; তারা বলল, ভাই, আমাদের কাছে তো টাকা-পয়সা নেই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার করে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা করে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলকটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারি সখ হয়েছিল,

কাজেই সে এই কথায় আর কোন অপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়া হল। নৌকা ভরা লোক, বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে ? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা হাত হতে নৌকাও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকাশুদ্ধ সকল লোকে বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকাখানি উল্টে।

তখন তো আর বিপদের অন্তই নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এতই বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধরে দু-জনার প্রাণ রক্ষা হল। কিন্তু তাদের রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় রাত্রির তো আর কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই তো বিপদ দেখছি! এখন কী করি বলতো!' গুপি বলল, 'করব আর কী ? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন ?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয়তো ওস্তাদ লোকের মত মরি, পাড়া গেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজি নই।

এই বলে দু-জনায় সেই ভেজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভেজা ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব ? এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টা করে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দু-জনারই মনে হল, যেন চারিদিকে একটা কী কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কী যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে ; তাদের চোখগুলো জ্বলছে

যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মূলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দু-জনার হাত-পা গুটিয়ে, পিট বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেড়িয়ে মুখ হাঁ হয়ে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধরে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবার জো রইল না।

ভুতগুলো কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গান বাজনা শুনে ভারি খুশি হয়ে এসেছে তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকি সুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!

একথায় গুপির আর বাঘার মনে একটু সাহস হল; তারা ভাবল, 'এতো মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখিনা!' এই বলে যেই আবার গান ধরেছে ভূতগুলো একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কী কাণ্ড কারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখাল বোঝবার জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারের দেখা পায়নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলেতো ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'বল বাবা মোরের গোদার বেটার বে-তে! তোদের খুশি করে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব।' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে আমাদের বাড়ি একটু গান বাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুশি করে দিব!' কাজেই তখন তারা দু'জনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখানে গান বাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নেই! তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, তোরা কী চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গান

বাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর কী চাইব, তা তো বুঝতে পারছি না।' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দু'জনকে দু'জোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি?'

তখন তো আর কোন ভাবনাই রইল না। গুপি আর বাঘা ভূতেদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে এখন রাজবাড়ি যাব।' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপি আর বাঘা দেখল, তারা দু'জনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এতবড় আর এমন সুন্দর বাড়ি তারা তাদের জীবনে কখনো দেখেনি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এরমধ্যে ভারি একটা মুস্কিল হল। রাজবাড়ির ফটকে যম-দূতের মত কতকগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! কাঁহা যাতা হায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজামশাইকে গান শোনাতে এসেছি।' তাতে দারোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো হিঁয়াসে! গুপি তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ঈস! আমরা তো রাজার কাছে যাবই!' বলতে অমনি জুতোর গুণে তারা তৎক্ষণাৎ গিয়া রাজা মশাইর সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ির অন্দর মহলে রাজা মশাই ঘুমিয়ে আছেন, রাণী তার মাথার কাছে বসে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেসে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল। জুতোর এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে তাতে তাদের একটুও আটকায়নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক আর না-ই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রাণী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন; রাজা মশাই

লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলেন ; রাজবাড়ি ময় হুলস্থূল পরে গেল, সিপাই সান্ত্রী সব খাড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি শুধু তখন বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব,' তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে না যেতেই, বেচারারা মারটা যা খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা,—কিছুই বাকি রইল না। রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিনদিন হাজতে ফেলে রাখ! তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

হায় গুপি! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিষ পাবে ভেবে, তার মধ্যে একী বিপদ! পেয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা একদিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার যে ঢোলকটি গেল, সেই হল সর্বনাশের কথা। বাঘা বুক চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গুপিদা!—ওঃ-ওঃ-হ-হ-হ-হ অ-অ! আরে ও গুপিদা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দাদা আমার ঢোলকটি যে গেল!

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কী দাদা? ঢোল গিয়েছে জুতো আর থলে তো আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা করে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'কী মজা করবে দাদা?' গুপি বলল, 'আগে তো খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।'

এই বলে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতর হাত দিয়ে বলল,

'দাও তো দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও!' অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও খেতে পান না। আর সে কী বিশাল হাঁড়ি! গুপি কি সেটা থলের ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনমতে সেটাকে বার করে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত!—শিগ্‌গির শিগ্‌গির দাও!' দেখতে দেখতে খাবার জিনিষে আর সোনারূপোয় বাসনে ঘর ভরে গেল। দু-জন লোক আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, দাদা, চল এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে!' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতেও কুকুর দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক না কী হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুসি হল; সে বুঝতে পারল যে, গুপিদা একটা কিছু মজা করবে।

দুদিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, আমাদের দু-জনের রাজ পোষাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোষাক বেরুল যে তেমন পোষাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোষাক তারা দু-জনে পরে, তাদের পুরোনো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে, জুতো পায় দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরে প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, 'মহারাজ, দু-জন রাজা আসছেন!' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে

গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল তার অন্ত নেই।

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোষাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছে যে, 'না-জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন। তারপর শেষে যখন গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আপনারা কোন দেশের রাজা?' তখন গুপি হাত জোড় করে তাঁকে বলল, 'মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!,

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কী ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে! যেমন বড় রাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি!' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দু-জনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সে-দুটো লোকের বিচার হবে—তিন দিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আগামী দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়েছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা গেল, সেখানে কেউ নেই, খালি ঘর পরে আছে।

তখনতো ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। দারোগা মশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর! আমাদের কোন কসুর নেই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটো তো মানুষ ছিল না, ও দুটো ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কী করে পালাল?'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজা মশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভূত! আমার ঘরও তো বন্ধ ছিল, তার ভিতরে এতবড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে করে বলল, 'মহারাজ! ভূতের ঢোলক বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না! ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন!'

রাজামশাইও বললেন, 'বাপরে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এখুনি ওটাকে এনে পোড়াও!'

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দু'-হাতে চোখ ঢেকে হাউ হাউ হাউ হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কী মশকিলই হয়েছিল! ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কী করবে! তখন, সেটা যে তারই ঢোল সে কথা কী আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কী সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়!

গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তা তো আর হবার জো নেই; সভায় বসবার সময় সেই যে জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক হুলুস্থূল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারি অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যারপরনাই গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন যে, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর একটা, তাতেও না সারলে দু-পাশে আরও দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

একথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল বদ্যিঠাকুর কী চমৎকার ওষধই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মন কতকটা ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন, গুপি তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এমন কী মুশকিলটা হল!' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে তো এতক্ষণে আমার ঢোলকটা পুড়িয়ে শেষ করে দিত! এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা তো বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ একটা কথা আছে, অনুমতি হয়ত বলি। রাজা বললেন, কী কথা?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের লোকটা, সেই দুই ভূত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি!' রাজা বললেন, 'তাই তো হে, আমারও যেন সেইরকমই ঠেকছিল! তা হলে তো বড় মুশকিল দেখছি! বল তো এখন কী করা যায়?'

তখন একথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাক, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন তো সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে! তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না!'

একথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতেদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে;

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হল। তারা

তো জানে না যে এর ভিতরে কী ভয়ানক ফন্দী রয়েছে ; তারা খালি ভাবল বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে। সঙ্গীত চর্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটা খুব নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে বাঘা দেখতে দেখতে ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই এখানে থেকে আর কাজ কী ? চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা এমন সুন্দর জায়গায় তো আর থাকতে পাব না, দু-দিন রইলামই বা !'

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় বসে গুনগুন করছে, এমন সময় বাঘা হঠাৎ ভয়ানক চেঁচামেচি করে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি, 'ও গুপিদা. ও গুপিদা !' ডাকটা খুবই কাছে শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় করে পাগলের মত নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা বলে চেঁচাছে'। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কী, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আর কী মজা—হাঃ হাঃ হাঃ !' বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল. দাদা এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি।' গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই. এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় বসে দু-জনায় খুব করে গান-বাজনা করা যাবে।'

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন সেই রাত্রে তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেইদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগান-বাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশাই পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন, খাওয়া-দাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তারা সকলে মিলে একসঙ্গে

সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালমতই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চলে গেলেই তারা গান-বাজনা আরম্ভ করবে, দারোগামশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চলে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর-একটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকজনদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল করে আগুন ধরাবি ; খবরদার, আগুন ভাল করে না ধরলে যাসনি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভালমতই ধরেছে, দারোগামশাই ভাবছেন 'এই বেলা ছুটে পালাই', এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধরে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখানে থেকে নরবার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরা, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই তো পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচে ছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজা মশাইকে সেই খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দু-চারজন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল ; তখন তারা ভারি আশ্চর্য্য রকমের

গান বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তার সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছেই সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা বাপকে দেখে যাক। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?' গুপি বলল, ঠিক বলেছ ভাই। তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ করে দাও। এই বলে তারা প্রাণ খুলে গান বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। একদল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলেটিকে শুদ্ধ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে তো আর তার শেষ অবধি না শুনে চলে যাবার জো নেই; কাজেই ডাকাতদের তখনই সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাতের ভিতরে আর সে গান-বাজনা থামালও না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বললেন, 'বাবা এমন আশ্চর্য গান আর কখ্খনো শোননি; এদের সঙ্গে নিয়ে চল।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন 'তোমরা আমার সঙ্গে চল। তোমাদের পাঁচশো টাকা করে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামহাশয়কে নমস্কার করে বলল,

'মহারাজ, দয়া করে আমাদের দু'তিন দিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতামাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব। রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এখানেই বিশ্রাম করছি ; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তারজন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মিলেনি। তার বাপ-মা এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় করে আনতে দেখেই বলল, 'ঐরে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে ; মার বেটাকে!'

বাঘা বিনয় করে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি ; দুদিন থেকেই চলে যাব, বাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিচিয়ে মা বাপের মৃত্যুর কথা বলে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে ইট মেরে তার পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে ; তার কাপড় ছিড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? তোমার এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা বড্ড বেঁচে এসেছি। মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলকটি ভেঙ্গে দিয়েছিল!' গুপিদের বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তার বাবা-মায়ের আদরে বাঘার দু-দিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দু-দিন পরে গুপি তার মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলে গেল, 'তোমরা তয়ের থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে,—'এমন ওস্তাদ আর কখন হয়নি. হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারি ভাল বাসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের সুখ দুঃখের কথা সব সময় গুপিকে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশাইর মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তাঁর কোন বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড় মুশকিলে পড়েছি, কী হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজা মশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড করে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধারণা, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারি ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ক্ষতি তো কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।' এ কথায় গুপি যারপরনাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল. 'দাদা, এবারে আমরা দু-জনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় ভয় হচ্ছে; যদি হঠাৎ প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়ত আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি করে দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মুখ্যুগুলোর হাতে আমার কী দশা হল!'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার ভয় কেটে গেল, তার পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিন কতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ঙ্কর ; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহা ধূমধামে পূজা হচ্ছে। দশ দিন এমনি তর পূজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশি করে তারা হাল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে বসে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নূতন ধরণের মিঠাই চাই, খুব সরেস!' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার মত নয়! তেমনি মিঠাই কেউ খায়নি, চোখেও দেখেনি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডীর রাজার ঠাকুর-বাড়ির বিশাল মন্দিরের চূড়োয় গিয়ে বসল। নিচে খুব পূজোর ধুম— ধূপধুনো শঙ্খঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই ; আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াং করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চূড়ো আঁকরে বসে তামাসা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাই গুলো আঙিনায় পড়তে অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দুচার জন সাহসী লোক কয়েকটা মিটাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই কথাবার্তা নেই—সে দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চেঁচাছে। তখন সেই আঙিয়া-শুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচির মিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামহাশয়কে বলেছে যে, 'মহারাজ!

ঠাকুর পূজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কী অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না। সে কথা শুনবামাত্র রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুজতে গুজতে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠান ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইর জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী অন্যায়! পূজো করি আমি. আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্য একটু গুঁড়োও রাখ না। তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব।' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোর হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ্‌রে! আমরা খেতে না খেতেই কী করে কোনখান দিয়ে ফুরিয়ে গেল। আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ সব মহারাজ একাই খাবেন।' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার মনে থাকে যেন!'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই এক প্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশ পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাসা দেখছে। আজ পূজোর ঘণ্টা অন্য দিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজা মশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোষাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুন্তল; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবুও রাজা মশাই আকাশ পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে

উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে দু-হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই-ধেই করে নাচনটা সে নাচলেন!

এমনি সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না; রাজামশাই তো লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এস তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে জয় জয় বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব।' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন আর তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কী আশ্চর্যই দেখলাম! রাজামশাই স্বশরীরে স্বর্গে গেলেন। দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন।'

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয়নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে বসে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দু'শো মোষ মেরে তোমাদের পূজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোন ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাই কিন্তু তাতেও একটু ভরসা হল না। তিনি আর কোন কথা না বলে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধরে এনেছি ; এখন কি আজ্ঞা হয় !' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এস।'

দুই রাজায় যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন কে তাঁকে ধরে এনেছে। হাল্লা জয় করা তো ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যটাই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কী উপকার করতে পারি ? শুণ্ডীরাজ্যের অর্ধেক, আমার দুটি কন্যা তোমাদের দু-জনকে দান করলাম।'

তখন খুবই একটা ধূমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে আনন্দে সঙ্গীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে ?

॥ সাতমার পালোয়ান ॥

এক আজার দেশে এক কুমার ছিল ; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত ; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসী গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া, সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখো যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কিনা।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার সেই লাঠি দিয়া মাছিগুলিকে এমনি এক ঘা লাগাইল যে, তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরও গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বড়ই বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস ?'

কানাই আর কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস ?'

শেষে একদিন কানাই একখান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, নাগরা জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই কোথায় যাও ?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে, এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে ? এখন তাহাকে বলিতে হইবে 'সাতমার পালোয়ান!'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই একখান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী হে ?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া গোরু বাছুর খাইয়া দৌরাত্ম্য করিয়া, দুদিনে দেশ ছারখার করিবার যোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে

গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কী করতে ? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না !'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই তো ! ডাক্ পালোয়ানকে !'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায় ! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায় !

কানাই বলিল, 'এখন আর কি ? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর-এক হাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভালো। একটা ঘোড়া হইলে আরও শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া হইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি—এক বুড়ীর ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ী কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ী ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ী অনেক

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয় বলিল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।'

নাতনী বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ী বলিল, 'তবে তোকে টঁ্যাপায় নেবে।'

বাস্তবিক টঁ্যাপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ী নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে টঁ্যাপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু টঁ্যাপাকে ভয় করবে! সেটা না জানি তবে কেমন ভয়ংকর জানোয়ার। যদি একবার সে জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হলেই তো মুশকিল দেখছি!'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমন সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই তো একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে টঁ্যাপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল।

বাঘ বেচারা আর কী করে! সে মনে করিল, 'এখন টঁ্যাপার হাতে পড়েছি, ওর কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া

দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কিনা। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে তার ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে, সত্য সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর-এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল।

এবার বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে

আমার আর রক্ষে নেই! তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করিবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারী আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুরমতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতেই রাজী হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন তাহার পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা ও খড়ের গাদা সব-সুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে, এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায়ে সাতটাকে মারে—বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! একথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে যে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না! বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেইসব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত

ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চেঁচাইতে চেঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ তো মন্দ নয়! পালাতে চলেছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধে জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন তো সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

॥ দুঃখীরাম ॥

দুঃখীরাম খুব গরিবের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল। সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, আর ছিল মামা কেষ্ট। দু বছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোন খবরই লইল না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরিবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া-দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে, কেষ্ট বলিয়া তাহার একজন মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে, একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই তো, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা তো জান না। আমরা যে দু মাসে একদিন খাই! কাল খেয়েছি, আবার দু মাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তার জন্য ভাবনা কী? তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না; দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাতো

ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাতো ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখী-রামেরও খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশি সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে ; সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল, 'মামা, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারি খুশি হইল, আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই খাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমায় নাই,—মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এর পর মামা কী করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিতে লাগিল। দুঃখীরাম বুঝিল, দাদা ঘুমাইয়াছে। এর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচখচ শব্দ শুনিয়া জানিতে পারিল যে, এবারে মামা উঠিয়াছে। তার পর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ—সকলই শুনা গেল। দুঃখীরামের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপিচুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল কেষ্ট পায়স রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সে হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দুঃখীরাম, কী হইয়াছে ?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কী করছিলে, আর একজন লোক খালি বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে।

তাই সে লাঠি হাতে ঘরের পিছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা, শীগগির ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে, লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথাও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়তো হঠাৎ তাহার কোন ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল।

খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে ধরিতে পারেই নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তুমিও বেরিয়ে গেলে আর যে লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল; আর দাদাও তখ্খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে, হরি নিশ্চয় পাড়ার কোনও দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে হরিকে এবং তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল যে, এর পর মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়সের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আবার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে দেখিতে সেই

পায়সের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তার পর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে—পায়সের হাড়ি খালি! তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায়, আর একটু একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামেরই কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপবেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়স চুরি করে কেন খেলি?—আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি?'

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল 'দোহাই ধর্মাবর্তার! ওঁরা দুমাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়স রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা, আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, তাতে যদি ওঁরা খামকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কী দোষ?'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক-চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি ভাল চাকরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোট

মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কী করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড় মন্ত্রীর বন্ধুতা ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষীরাজ ঘোড়া মানুষের মতন কথা কহিতে পারে, শূন্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে, আর ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ, বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক-মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, 'আচ্ছা বাজি রাখুন। যদি আমার কথা সত্য হয় তো কী হইবে ?'

মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার আর যদি তোমার কথা সত্য না হয় ?'

সওদাগর বলিল, তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কী হইল তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে, আর পক্ষীরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী চিন্তা করিয়া তাহাকে একটা উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয়ের একটু বসিবার দেরি সয় না। তিনি না বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কী হইল ?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন ; সওদাগর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কী বন্ধু! আপনার মতন লোকের ঐ সামান্য দড়িগাছাটায় লোভ! একটা কোন দামী জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর তো চক্ষু স্থির! অত

সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া তিনি ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে, এ ছোট মন্ত্রী ছাড়া আর কাহারও কর্ম নয়, তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর- বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় গিয়া জোড়হাতে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী বড় মন্ত্রী?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে, কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষীরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আরও বিনয় করিয়া, কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন, 'মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোট মন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেন। রাজা বলিলেন, 'সে কী রকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আমাকে আনিতে দেন নাই।'

রাজাদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিশ দিতেন তো অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন তো মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিত না, সুখে ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর

পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপিচুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাল লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর এক টুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কী দিতে পারি, এই নেকড়া আর কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রয় করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকেও রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।'

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছেন, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ রাখিয়াছেন আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেলড়াখানা পরেন। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাঁহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিলেন সে ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ি ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনও দেখেন নাই। বুড়িকে দেখিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ চুপিচুপি সেই বুড়ির দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন, আর সেই

টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া নিলেন। কী আশ্চর্য! সেই টুকরা গুলি জলে পড়িবামাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ি খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিলেন, 'আমি, দুঃখীরাম।' বুড়ি বলিল, 'বাবা, তুমি কী চাও?' দুঃখীরাম বলিলেন, 'আমি কিছুই চাই না। তুমি বুড়োমানুষ, বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তু-টন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ি বলিল, 'বাপু তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিন্তু কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবেন না, সুতরাং বুড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে এক বর দিয়া যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।'

দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এ সকল কথা তিনি শুনিতে পাইলেন না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রি হইবে, তবে তাঁহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ সকল কথা ভাবিয়া বেচারীর মনটা একটু দুঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছেন না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়া ছিল, তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেলেন। একে মন ভাল নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিলেন, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল!'

যেই এই কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল, যেখানে ভয়ানক বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধূ ধূ করিতে লাগিল। কী সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কী করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া

একেবারেই অবাক ! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপনমনে খালি হাঁটিয়া চলিলেন। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরও বেশি হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল ; সে যে-সে কুড়াল নয়, জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারি হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মত ভারি ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি আর পারি না. অত ভারি কুড়ালের হাত-পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতন তাহার সব পা হইল ; আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরও গোল লাগিয়া গেল। তিনি একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, হইল কী !

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে ; সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ঐ রকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কী কর ? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কী করে ? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দারোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে দুঃখীরামের কুড়াল হাত-পা-শুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত ! 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত-পা উঠাইয়া দারোয়ানজী আপনি এক লাফে একেবারে

গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালা তাড়াতাড়ি দারোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে ফেলিয়া ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল, যে, সেটা কাহাকে কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দুজনেই তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানীরা তাহাই করিতেছে— পুলিস-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এই করিয়া দেশের প্রায় সকল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাতো ভাই কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতরে ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল যে, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনও হাঁটে? এ নিশ্চয় কোন জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে।' রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী, এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মত দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কী ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পাও

নাড়িতে পারিল না ; বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের মতই তাহাদিগকে আধ মাইল খানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এর পর কী হয়। স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন 'শক্ত করিয়া বাঁধ্।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'অন্যের বেলা বলা খুব সহজ ; তোমাকে একবার ও রকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে ?'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে চিত করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখীরামের মতন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন ; কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঠিক দুঃখীরামের মতন বাঁধা হইয়াছে কিনা। যখন দেখিল যে, দুজনকেই ঠিক একরকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজা-মহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন। তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে সকল পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে রাজামহাশয় মাঝখানে

উঠিয়া গেলেন। ঠিক হইল খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কী বলিব! অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা সে ভাবে না; কিন্তু ক্ষুধা তো কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রীমহাশয় সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আহা, ওসব জিনিস যদি এখন আনিয়া দিত!'

রাজামহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে কত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালা-সুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল। মন্ত্রীমহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ হইতে না হইতে তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না; তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল, 'হায় রে হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে একলাফে উঠিয়া বসিয়া দুহাতে লুচি, মাংস, পোলাও, পায়স, মেঠাই, মণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর, পালাবে।'

আর একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা, বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে একটু খেয়ে নিতে দে।'

ও-কথা শুনিয়া সকলে বলিল, 'আহা, থাক্ থাক্!'

দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল; দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরও হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মতো বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।'

রাজা আর কি করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা তো সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে একঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেইদিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু-হাতে সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে-করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।'

এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, 'সর্বনাশটা যে কী করলে তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দু-হাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন।

ক্রমে দেখা গেল যে, যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস, কেহ পাইক, কেহ দারোয়ান, কেহ দোকানী, কেহ ভিখারী।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।'

কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারও ইচ্ছাও নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন।

দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল হাতে, কালো ভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড়হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কী-না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ, আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথার তিনি আর কী উত্তর দিবেন! কেবল বলিলেন, 'আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর-সকলের কী হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে, কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল।

দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার-যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক।'

॥ ঘ্যাঁঘাসুর ॥

এক যে ছিল রাজা, তাঁহার ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন-জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়; এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন যে, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষীর বাড়ীতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষী অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর লেবু তাহাতে হইয়াছে। লেবু তো নয়, যেন রসগোল্লা! এক-একটা বড় কত! যেন এক একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখ-ও নাই, খাও-ও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষীর তিন ছেলে; যদু, গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষী যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল যে, 'শীগ্‌গির এগুলি

রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে এক হাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ঝুড়িতে কি-ও ?'

যদু বলিল, 'ব্যাঙ'।

সেই লোকটি বলিল, ,আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজার দারোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যারপরনাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজামহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকনা খুলিলেন ; আর অমনি চারিটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে-প্রাণে বাড়ি ফিরিল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এর পর চাষী আর এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি।'

একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দারোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকতে দেয় নাই। তাহারা বলিল যে, 'তোরই মতন একটা সেদিন এসে রাজামশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তাই আবার একটা কি করে বসবি কে জানে!'

অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু

সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া-গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষী তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও একঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল।

একহাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝুড়িতে কি-ও?'

মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যারপরনাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাতজোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি হয় না, তা হলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক, মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামশায় তো খুবই খুশি! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়, আমাকে খবর দিস্!' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে।

ইহাতে রাজামহাশয় যারপরনাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই তো, করিয়াছি কি! এখন যে চাষীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়!' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে, চাষীর ছেলেকে যেমন করিয়া হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে যে, 'এর পরই বুঝি মেয়ের বিয়ে দিবে।' এনন সময় রাজমহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমন চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া দিতে না পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মান্‌কে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা হচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেইদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে; পরিশ্রমেরও কসুর নাই।

এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে?'

'গামলা।'

'আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল; যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মতো গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন-চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল; এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে?'

মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল, 'জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজামশাই বলেছেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন।'

এই কথা শুনিয়া এলহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই, অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজারাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর তা কি বলিব! যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজামহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিকলালকে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না; আর একখানা কাজ করিয়া দিতে হবে। একগাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখী, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্‌ঘুটে চেহারা খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, রসগোল্লাটির মতো টপ্‌ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক

চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে-বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারও বাড়িতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘ্যাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঁঘা তার কোনো সন্ধান বলতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা কোরো তো!'

মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।'

আর-একদিন সে আর-এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার বেয়রামটা যে কি কোনো ডাক্তার-কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।'

মানিক বলিল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব!'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিগ্যেস কোরো তো! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে ক'রে দিনরাত্তির মানুষই

পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।'

মানিক বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিগ্যেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না, ঘেঁঘী ছিল। তখন তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শীগ্‌গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখিতে পেলেই গিল্‌বে।'

মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন ক'রে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর বুড়ো পার ক'রে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন ক'রে?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে এক'শ খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু?'

মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; একগাছি পালক আমার চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক্। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।'

মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে; সবতাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে, জোরে-জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ।

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া

ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঘা কিছুটা শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইল ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটা লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে! হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হইয়াছে, অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ তো একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। 'সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ—।' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল 'কোলা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।'

আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে ?' ঘ্যাঁঘা বলিল, 'সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না! তাহলেই তো সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে।'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত

ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এর পর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল?'

মানিক বলিল, 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।'

বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এর পর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তাহলেই তোমার ছুটি।'

এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকার করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।'

মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল! বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?'

মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোলা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর এমনি যে মেয়ে মড়ার মতন পড়িয়া ছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশি লইল, তাহা কি বলিব? মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যারপরনাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই

বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়।

রাজা মহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন যে, ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাতজোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই ; ততক্ষণে সে ডাঙায় উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির পানে ছুটিয়াছে, তাড়াতাড়ি রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনও ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটি বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

॥ তিনটি বর ॥

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মতো অভাগা আর কোনো দেশে কখনো জন্মায়নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় সে আর-এক জিনিস গড়ে রাখত ; একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙ্গে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাঁকি যে কত দিত, সে কী বলব ! কাজেই কেউ তাকে কোনো কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না ; লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হত।

একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভয়ানক শীত। গায়ে জড়াবার কিচ্ছু নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে ; ঘরে খাবার নেই। এমন সময় কোত্থেকে এই এক লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বলল, 'বাবা, খাবার যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি, তোমাকে কোত্থেকে দেব ? তুমি না-হয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উসকিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বলল, 'আহা, বাঁচালে বাবা ; শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বসল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উসকিয়ে তাকে গরম করে দিল। যাবার সময় বুড়ো তাকে বলল, 'তুমি আমাকে খেতে দিতে পারনি, তবু তোমার যতদূর

সাধ্য তুমি করেছ। এখন তোমাব যেমন ইচ্ছা, তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল, কিন্তু কী বর চাইবে, বুঝতে পারল না। বুড়ো বলল, 'শীগ্‌গির বলো ; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি—ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বলল, 'তবে এই বর দিন যে, আমার হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পারবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামতে পারবে না।'

বুড়ো বললে, 'আচ্ছা তাই হবে। আর কী বর চাই?'

কামার বলল, 'আমার এই চেয়ারখানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে ন্য।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাও হবে। আর কী?'

কামার বলল 'আমার এই থলিটির ভিতরে আমি কোনো টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে তা-থেকে বার করতে পারবে না।'

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে বললেন, 'অভাগা তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবার-সুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি।'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার আবার বসে-বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল যে, তাই তো এই তিন বরের জোরে তো আমি বেশ দু-পয়সা রোজগার করে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ করে দেব।' দেশের যত কিপটে পয়সাওয়ালা লোক, সে কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এক-একজন আসে, আর কামার তাকে দু-হাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে

চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভাল মতো তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না ক'রে তাকে উঠতে দেয় না। একনি করে দিনকতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারুর হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে গেল ; যখন আর-কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। এই সময় কামার একদিন একটা বনের ভিতরে বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিদে গোছের বুড়োকে দেখতে পেলো। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবল, বুঝি কোনো উকিল হবে। কিন্তু তখনই আবার কোনো উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারি অসম্ভব মনে হলো। তারপর আবার সে ভাল করে চেয়ে দেখল যে সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়েত মতো খুর আছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মতো থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিল।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড় হাতে শয়তানকে নমস্কার করে বলল, ,প্রণাম হই।'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে তার নাম ধরে বলল, 'কী হে, কেমন আছ ?'

কামার বলল, 'আজ্ঞে, কেমন আর থাকবো ? দুবেলা দুটি ভাতও খেতে পাই নে।'

শয়তান বলল, 'বটে ! তুমিও ঢের কষ্ট পাচ্ছ ? তুমি কেন আমার চাকরি করো না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজী হল, যদিও সে জানত যে তার কাজে একবার ঢুকলে আর-কেউ ছেড়ে আসতে

পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে বলল, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও ; সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এই বলে শয়তান চলে গেল। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরল।

সেই তিন থলি মোহর দিয়ে কামার যারপর নাই খুশি হয়ে নাচতে-নাচতে বাড়ি এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম করে নেবে। সাত বছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না। এখন তার গাড়ি-ঘোড়া চাকর-বাকরের অন্ত নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সাও নেই, একমুঠো চালও নেই। তখন কাজেই তাকে আবার সেই কামারই হতে হল, নইলে খাবে কী ?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটছে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে-ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, 'এই রে, খদ্দের !' তারপর চেয়ে দেখল 'ওমা ! এযে শয়তান !'

শয়তান বলল, 'মনে আছে তো ? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

কামার বলল, 'তাই তো, আমি গেলে আমার ছেলেপুলেগুলো কী খাবে ? তোমার তো কতই লোক আছে, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও !'

শয়তান বলল, 'সে হবে না ! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ ; চলো এখনই চলো।'

কামার বলল, 'তুমি ছাড়বেই না যখন তো চলতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজ শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভাল হত, এর দরুণ কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার এই উপকারটুকু করো না! আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি বসে হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানিক পেটো।'

শয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারি ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পেটাতে আরম্ভ করলে আর কামারের হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর এক মাসের ভিতরে সেইমুখোই হল না।

একমাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখল যে শয়তান ঠনাঠন ঠনাঠন করে লোহা পিঠছে, আর তার দশা যা হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতক্ষণ বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বলল, 'ভাই, ঢের তো হয়েছে; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তোমাকে আরও তিন থলি মোহর দিচ্ছি, আরও সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবল, মন্দ কি। আর তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাছেই সে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার ধুমধাম জুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশি দেরি হল না, তখন আর হাতুড়ি-পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে তার বাড়িতে ভারি গোলমাল। কি কথা নিয়ে কামার তার গিন্নীর উপর বিষম চটেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নীও যেমন তেমন মেয়ে নয়, পাড়ায় সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকে সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি, কাজেই জিত হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এসব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে ধরে মারিস্? চল্, আমার সঙ্গে চল।'

শয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশি হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটে রে হতভাগা, তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলছিস্!' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকে-মুখে এমনি সপা-সপ মারতে লাগল যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল—সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে ওঠবার জো নেই।

কামার দেখল যে শয়তান এবারে বেশ ভালমতোই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিপে ধরল। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়ো বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই শয়তানের নাকটা রবারের মতো লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু-হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হল তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকিসুরে বলল, 'দোহাই দাদা! আর টেনো না, মরে যাব।'

কামার বলল, 'আরও তিন থলি টাকা আর সাত বছরের ছুটি,—দেবে কিনা বলো।'

শয়তান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এক্ষুণি এক্ষুণি এই নাও।' বলতে বলতেই

তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হল, কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে যাও।' শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে ছুট যাকে বলে!

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে হাসিটা যে হাসল। আর সাত বছরের জন্য তাদের কোনো ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হল, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হল, ততদিনে শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হল।

সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গতবারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে ভারি এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায়, তাহলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। তখন শয়তান করল কি, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে তুলে নিয়ে যাবে; তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরল। তখন থলের ভিতর থেকে শয়তান হেসে তাকে বলল, 'কী বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে অমোকে ঘরে এনেছ, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে।'

কামার বলল, 'কী রে বেটা? তুই নাকি! তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটেনি, তাই আমার থলের ভিতরে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

এ কথায় শয়তান এমনি রেগে গেল যে, পারলে সে তখনই কামারকে

মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে তো শেষ করবে! সে যে সেই বিষম থলে,—তার ভিতরে ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নেই। শয়তান বেচারার খালি ছটফটানিই সার হল, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নীকে ডেকে দুজনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে দমাদ্দম-দমাদ্দম এমনি পিটুনি জুড়ল যে পিটুনি যাকে বলে। পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচাল। তারপর যখন আর চেঁচানি আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'ছেড়ে দাও দাদা, তোমায় পায়ে পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেব,—আর কখনো তোমার কাছে আসব না।'

এ কথায় কামারের গিন্নী বলল, 'ওগো, সে হলে নেহাত নন্দ হবে না; দাও হতভাগাকে ছেড়ে।' তখন কামার বলল, 'কই তোর মোহরের থলে?' বলতে বলতেই এমনি বড়-বড় মোহরের এসে হাজির হল যে তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে তুলতে পারে না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বলল, 'যা বেটা। ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি তো টের পাবি।' ততক্ষণে শয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে, কামারের সব কথা শুনতেও পেল না।

সেই ছটা থলের ভিতর এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারলে না। চার থলে ভাল করে ফুরুতে না ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে এখন তো হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটার একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি না, যদি কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হল, যিনি তাকে সেই তিনটি বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারী খুশি হয়ে ভাবল, এই ঠাকুরটী না আমাকে সেই

চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন? ইনি অবিশ্যি আমাকে ঢুকতেও দেবেন।'

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যারপরনাই রেগে বললেন, 'এখানে এসেছিস কী করতে? পালা হতভাগা শীগ্‌গির পালা।'

কাজেই তখন বেচারা আর কী করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চলল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে শয়তানের দারোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছয়টা দারোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বলল, 'মহারাজ। সেই কামার এসেছে।' তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ দিল! তারপর পাগলের মতো ফটকের কাছে ছুটে এসে দারোয়ানদের বলল, 'শীগ্‌গির দরজা বন্ধ কর! আঁট হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না। ও এলে আর কি আমাদের রক্ষে থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বলল, 'কি দাদা। কী খবর?' সে কথা শেষ না হতেই শয়তান এক লাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিল যে কী বলব! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নেবেনি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায়-জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখতে পেলে বলে, 'ঐ আলেয়া!'